ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)
-এর স্মৃতিচারণ

ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো

৭ম পর্ব

শাইখ আইমান আজ জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)
এর স্মৃতিচারণ

ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো

(৭ম পর্ব)

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

أيام مع الإمام (٧)

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ৩৫:০০ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: ১৪৩৬ হিজরি, ২০১৫ ঈসায়ী

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

بسم الله، والحمد لله، والصلاة السلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

বিশ্বের আনাচে কানাচে অবস্থানরত মুসলিম ভাইয়েরা, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

এটি ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো সিরিজের (أيام مع الإمام)-এর ৭ম পর্ব। এই পর্বে আমি ইমামুল জিহাদ, মুজাদ্দিদ, শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সাথে কাটানো কিছু মুহূর্ত নিয়ে কথা বলব।

গত পর্বে তোরাবোরায় শাইখের সাথে আমার কিছু স্মৃতির কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। বন্ধু এবং শত্রুদের নিয়ে কথা বলেছি। তোরাবোরার সেসব শহীদদের নিয়েও আলোচনা করেছি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন।

এর আগের পর্বে আমার একটি ভুল হয়েছিল। তা হলো, শহীদ আলি মাহমুদ রহিমাহুল্লাহ'র নাম আমি ভুল করে শহীদ মুহাম্মাদ মাহমুদ বলে ফেলেছিলাম। তিনি তোরাবোরাতে এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর এবং সমস্ত মুসলিমের ওপর রহম করুন।

আজ আমি এই আলোচনার কিছুটা পূর্ণতা দিতে চাই। বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা শেষে এবার সেসব শত্রুদের নিয়ে আলোচনা করব, যারা তোরাবোরায় আমাদের প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ তাদের কয়েকজনকে উল্লেখ করব। সেসব বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে অন্যতম হলো, হযরত আলী নামক এক ব্যক্তি। এই লোকটি ছিল শাইখ মুহাম্মাদ ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ'র হিযবে ইসলামি দলের একজন সদস্য। কিন্তু আফগানিস্তানে মুজাহিদদের মাঝে পারস্পরিক যুদ্ধের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার পর যখন তালেবানের বরকতময় অগ্রযাত্রা আরম্ভ হলো এবং তারা আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার শুরু করল, তখন সে তালেবান-বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোট মাসউদ গ্রুপের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। এর আগেও বলেছি, আমেরিকার সাথে এ গ্রুপের যোগাযোগ ছিল এবং তাদের নেতা আহমাদ শাহ মাসউদ মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের সাথে আঁতাত করেছিল। এ কথা আমরা ৯/১১

হামলা সম্পর্কে আমেরিকার কংগ্রেস প্রশাসনের উদ্ধৃতি থেকেই 'আস-সাহাব' মিডিয়ায় উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা এটাও বলেছিলাম, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর সাথীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে আমেরিকার সাথে সেও জড়িত ছিল। যাই হোক, এই নিকৃষ্ট দলটির সাথে যোগ দিয়েছিল সেই হযরত আলী।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই আহমাদ শাহ মাসউদ নিহত হয়। সে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গিয়ে ইউরোপিয়ানদের সাথে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে আফগানিস্তানে ইসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এবং আল-কায়েদা ও উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা, এর দ্বারা আমেরিকার কাছে তার একটা অবস্থান তৈরি হবে এবং আমেরিকারও স্বার্থ রক্ষা হবে। আমরা এ বিষয়টা আস-সাহাব মিডিয়া কর্তৃক পরিবেশিত (قراءة للأحداث) 'ঘটনাপরিক্রম' এবং (حقائق الجهاد وأباطيل النفاق)-'জিহাদের বাস্তবতা ও নিফাকির অসারতা' নামে দুটি অডিওতে উল্লেখ করেছি।

আমেরিকার সৈন্যরা যখন আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, তখন হযরত আলীও তাদের সাথে জালালাবাদ প্রবেশ করে। তাকে জালালাবাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তোরাবোরায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আমেরিকার হামলা শুরু হলে সে মুজাহিদদের অবরোধকারী একটি গ্রুপের লিড দেয়ার দায়িত্ব নেয়। সে অবরোধকারী দলের কমান্ডারদেরকে উৎসাহ দিত। তারা যেন কোনোভাবেই মুজাহিদদেরকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না করে। সে তার সহকর্মী এক কমান্ডারকে সতর্ক করে এবং ভয় দেখিয়ে বলছিল, 'একজন আরবও যদি তোমার পাশ দিয়ে জীবিত বের হয়ে যায়, তাহলে তোমাকে হত্যা করব।' উত্তরে কমান্ডার বলল, 'আমার পাশ দিয়ে কোনো আরব যেতে পারবে না। বরং তুমি দেখো, তারা কার পাশ দিয়ে যায়?' এই পুরো ঘটনাটি আমাদের এক ভাই সরাসরি দেখছিল এবং তাদের কথোপকথন শুনছিল। আমি আগেও বলেছি যে, আমাদের ব্যাপারে অবরোধকারীদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বেশি সংশয় ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমনই সন্দেহজনক ছিল। তাদের সম্পর্ক স্বার্থ আর নিফাকির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের কেউই কাউকে সম্মান করত না। আল্লাহর রহমতে তাদের মনে পরস্পরের জন্য মারাত্মক সন্দেহ ছিল। সুবহানাল্লাহ!

আরেক বিশ্বাসঘাতকের নাম হলো ‘মুহাম্মদ যামান’। শাইখ নিজেই তার সম্পর্কে আমাদের বলেছিলেন। শাইখ যখন জালালাবাদে ছিলেন, তখন মুহাম্মাদ যামান তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। তারপর যখন ক্রুসেডাররা তোরাবোরাতে মুজাহিদদের ওপর অবরোধ করে, তখন সে অবরোধকারী একটি গ্রুপের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আমেরিকার গোলামির ব্যাপারে তার মাঝে আর হযরত আলীর মাঝে কঠিন প্রতিযোগিতা চলত।

একবার মুহাম্মাদ যামান শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ-কে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। সে শাইখের কাছে চিঠি দিয়ে একজন দূত পাঠায়। আমিও সে চিঠি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। অতঃপর যে সকল ভাই পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিচ্ছিলেন, তারা দূতকে আটকে দেয় এবং জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কী চাও?’ সে বলল, ‘এটা মুহাম্মাদ যামানের পক্ষ থেকে শাইখের কাছে প্রেরিত একটি পত্র।’ ভাইয়েরা বলল, ‘আমরা জানি না উসামা বিন লাদেন এখানে আছে কি নেই। কিন্তু তুমি চিঠিটা আমাদের কাছে দিয়ে যাও।’

যাই হোক, অবশেষে চিঠিটি শাইখের কাছে পৌঁছল। দুই পৃষ্ঠার চিঠিতে যা লেখা ছিল, তার সারমর্ম ছিল এমন, ‘শাইখ উসামা, আপনি হলেন ইসলামের আমানত এবং গৌরব।’ এভাবেই প্রশংসা করে করে সে চিঠিটি লিখেছিল : ‘আপনার সুরক্ষা উম্মতে মুসলিমাহর জন্য কল্যাণকর। আমি দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলছি যে, আমি আপনাকে নিরাপত্তা দেবো। আপনার সেবা করে যাব। আসুন, আমার সাথে। আমার গাড়িতে করে আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি আমার বাড়িতে আমার পরিবার-পরিজনের সাথেই থাকবেন। আমার পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। যেমনিভাবে আমি আমার পরিবারের জন্য প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করি, তেমনিভাবে আপনার জন্যও সেরূপ জানপ্রাণ দিয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করব। আপনি নিজেকে বিপদের মধ্যে রাখবেন না। আমি আশঙ্কা করছি, আমেরিকানরা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে।’ এমন আরো বহু কথা সেই পত্রে লেখা ছিল।

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। যে ভাই পত্রবাহক ও আমাদের মাঝে বার্তা বিনিময় করছিলেন, শাইখ তাকে বললেন, ‘পত্রবাহককে বলে দাও, উসামা বিন লাদেন এখানে নেই। তিনি কোথায় আছেন আমাদের কারো জানা নেই!’ এ

কথা শুনে বার্তাবাহক মুহাম্মাদ যামানের কাছে ফিরে গেল এবং আমাদের বার্তা শোনাল। কিন্তু মুহাম্মাদ যামান তাকে এই সন্দেহে বন্দি করল যে, সে তাকে মিথ্যা বলছে। আসল কথা হচ্ছে তাদের মাঝে সম্পর্কটাই ছিল এমন সন্দেহ আর সংশয়ে ভরা।

পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ যামান পেশাওয়ারে মারা যায়। আমেরিকানরা তাকে সন্দেহ করে। সম্ভবত, হযরত আলী তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। আমেরিকানরা তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পায়নি। কিন্তু তাকে বিশ্বাসও করতে পারেনি। তাই তাকে তাড়িয়ে পেশওয়ারে পাঠিয়ে দেয়। শুনেছি সেখানেই সে নিহত হয়। আল্লাহই তার অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন।

বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে তৃতীয় আরেক খবিস হলো ‘হাজি দীন মুহাম্মাদ’। সে জালালাবাদের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল। এই লোকটি শাইখ ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ’র সংগঠনের একজন সাহায্যকারী ছিল। যখন শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ জালালাবাদ আসেন এবং ইউনুস খালিস রহিমাহুল্লাহ’র আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন হাজি দীন মুহাম্মাদ নিজেকে উসামা রহিমাহুল্লাহ’র শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী বলে প্রকাশ করার চেষ্টা করত। এরপর যখন ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে, তখন এই ব্যক্তি আমাদের সাহায্যকারী আনসার ভাইদেরকে চাপ প্রয়োগ করত। যেন তারা আমাদের সাহায্য করা ত্যাগ করে। তাদেরকে বলত, ‘তোরাবোরায় এখন যারা আছে, তাদের উচিত হচ্ছে জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করা। জাতিসংঘ প্রত্যেককে আপন আপন দেশে পাঠিয়ে দেবে।’ আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমরা আত্মসমর্পণ করিনি।

তার সাথে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ’র একটা পূর্বপরিচয় ছিল। পরিচয়টা তেমন শক্তিশালী ছিল না বরং স্বাভাবিক পর্যায়ের ছিল। এই সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাকে উপদেশ দিয়ে একটি পত্র পাঠালেন। কারণ, তাকে জালালাবাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হতো। যখন জালালাবাদ থেকে তালেবান চলে যায়, তখন তার ভাই সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হয়। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।

তো শাইখ উসামা তাকে এই মর্মে পত্র পাঠান যে, 'হাজি দীন মুহাম্মাদ, আমরা দুজনই বয়সের ভারে বুড়ো প্রায়। দুজনের চুলেই পাকন ধরেছে। জানি না কখন কাকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হয়। খুব সম্ভব আগামী দিন আমাদের যেকোনো একজন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবো। হয়তো আমি, না হয় তুমি। তোমার অবস্থা হলো, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করছ। অতঃপর এই পাপের বোঝা নিয়েই তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ও তোমাদের মাঝে তো কোনো সমস্যা নেই। তোমার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, মন্ত্রিত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি নিয়ে আমরা কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। তোমার কাছে আমরা এসব চাইও না। জিহাদের শুরু থেকেই তো আমরা তোমাদের ভাই হিসেবে আছি। আমরা মুসলিম, দ্বীনের জন্য স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসেছি। আমরা মুসাফির, রোযাদার। আমাদের মাঝে তো কোনো বিরোধ নেই। সমস্যা হচ্ছে আমাদের আর আমেরিকার মাঝে। অতএব আমাদের এবং আমেরিকার মাঝ থেকে তোমরা সরে যাও। আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করো না।'

সে এই চিঠির কোনো গুরুত্বই দিল না বরং অবজ্ঞা করল। এমনকি আমরা এমনও শুনেছি যে, সে বলেছে, 'উসামা বিন লাদেন আমার কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলছে, আমরা দুজনই বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমরা তোমাদের ভাই। উসামা আমার কাছে কী চায়? তালেবান চলে গেছে, আমেরিকা আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে। আমি কি তার কথা অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দেবো?' এভাবেই সে অতীতের জিহাদি জীবনকে কলঙ্কিত করল।

হাজি দীন মুহাম্মাদের দুজন সহোদর ভাই ছিল। একজন আব্দুল হক, অপরজন আবদুল কাদির। আব্দুল হক আমেরিকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল। আমেরিকা কারজাইর চেয়ে তাকেই বেশি ভরসা করত। এই যুদ্ধের শুরুর দিকে সে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তার সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিল। তার কাছে একটি স্যাটেলাইট ডিভাইসও ছিল। তার সম্পর্কে কলিন পল বলে, 'আফগানিস্তানে আমাদের লোক থাকলে অমুক আছে। আমরা তার কাছে ভালো কিছুর আশা করি।' আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে যুদ্ধের শুরুর দিকেই তালেবান তাকে সম্পদসহ গ্রেফতার করে দেউলিয়া করে দিয়েছে।

তার দ্বিতীয় ভাই আব্দুল কাদির। তালেবান আন্দোলনের আগে সে জালালাবাদের গভর্নর ছিল। যখন তালেবান জালালাবাদ ছেড়ে চলে যায়, সে পুনরায় জালালাবাদের গভর্নর পদ দখল করে। তারপর কারজাই সরকারের মন্ত্রীর পদে সমাসীন হয়। আহমাদ শাহ মাসউদের পরিচালিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের একজন সদস্যও ছিল সে। কিন্তু তার মাঝে ও শাহ মাসউদের মাঝে কঠিন শত্রুতা চলছিল। যেহেতু তারা দুনিয়াপূজারি, তাই শত্রুতা থাকাটা স্বাভাবিক। কাবুলে একটি গুপ্তহত্যায় সে নিহত হয়। অনেকেই এমন মনে করেন যে, উত্তরাঞ্চলীয় জোটই তাকে হত্যা করে। প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত। আমেরিকার সহযোগী এই পরিবারের এমনই করুণ পরিণতি হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব ফিতনা ও মন্দ পরিণতি থেকে হেফাজত করেছেন। জীবনের এমন মন্দ সমাপ্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

ইতিপূর্বে আমি এমন কিছু অবরোধকারীর কথা আলোচনা করেছি, যারা আমাদের সাথে মাঝামাঝি অবস্থানে ছিল। এক ব্যক্তি আমাদেরকে অবরোধেও অংশ নিয়েছিল আবার তালেবানেরও দায়িত্বশীল ছিল। এমনকি তালেবান চলে যাওয়ার পরেও সে একটি অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল। অবরোধের সময় সে আমাদেরকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছে যে, আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মজার বিষয় হলো, তোরাবোরা অবরোধকারীদের মাঝে আমাদের এক আনসার ভাইয়ের কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারা ট্যাঙ্ক ফোর্সে ছিল। তিনি ওয়ারলেসের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করতেন। একজনকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, ‘হে অমুক, কেমন আছ তুমি? সাবধান! আমাদের কোনো আক্রমণ করবে না। অন্যথায় আমরা তোমাদের এন্টি ট্যাঙ্ক দিয়ে আঘাত করব। তোমাদের হত্যা করব।’ এভাবে তারা বলত আর হাসত। বিষয়গুলো এমনই মিশ্রিত ছিল।

হাজি দীন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। যেসব আনসার ভাই আমাদেরকে সাহায্য করতেন, সে তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করত। এমন একজন আনসার ভাই ছিলেন। যিনি আমাদেরকে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে সাহায্য করতেন। তার সাথে হাজি দীন মুহাম্মাদের পরিচয় ছিল। তো দীন মুহাম্মাদ একদিন

তাকে বলল, 'এসব আরবদেরকে আর সাহায্য করো না। অন্যথায় আমেরিকা তোমার গ্রামের ওপর ৫০টি বিমান পাঠিয়ে পুরো গ্রামকে ধ্বংস করে দেবে।' আনসার ভাই উত্তরে তাকে বললেন, 'আমি কীভাবে আরবদেরকে পরিত্যাগ করব?! তাঁরা তো আমাদের জিহাদি ভাই। তাঁরা মুসাফির, গুরাবা, রোযাদার। কেবল আল্লাহর জন্য পরিবার-পরিজন ও দেশ ছেড়ে এসেছে। তাহলে আমি তাঁদেরকে কীভাবে পরিত্যাগ করব?!' পরবর্তী সময়ে সত্যিকারার্থেই আমেরিকা তার গ্রামে বিমান হামলা করে সেই গ্রামের ৫০ জন নাগরিককে শহীদ করে এবং তার পরিবারের ১৮ জনকে শহীদ করে। ঘটনাটি এর আগেও হয়তো বলেছি।

আরেকটি হাস্যকর ঘটনা, তবে অবরোধকারীদের পারস্পরিক সন্দেহের দুঃখজনক ঘটনা। একরাতে পাহাড়ের চূড়ায় আমরা কিছু মুনাফিককে দেখতে পাই। ঠিক আমাদের বিপরীত পাশে পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে একটি কক্ষও ছিল। মাগরিবের সালাতের পূর্ব-মুহূর্তে সেখানে তারা আগুন জ্বালিয়েছে। এই অবস্থা দেখে ভাইয়েরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, 'তাদেরকে কীভাবে ছেড়ে দিই! নাহ, তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রথম দিন থেকেই যদি তাদেরকে ছাড় দিই, তাহলে তারা এখানে আসতেই থাকবে। বরং তাদের ওপর গুলি নিক্ষেপ করা উচিত। যাতে তারা এখান থেকে নেমে যায়।' তখন একজন আফগানি আনসারি ভাই বললেন, 'তাদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদের নেতার সাথে কথা বলছি।'

তাদের মাঝে আশ্চর্য ধরনের এক সম্পর্ক ছিল! অতঃপর তিনি তার সাথে যোগাযোগ করে বলেন, 'এটা কীভাবে হলো? তোমার কিছু সাথী আমাদের বরাবর সামনের পাহাড়ে অবস্থান করছে। প্রত্যুত্তরে মুনাফিক সরদার বলল, 'আচ্ছা! ইনশাআল্লাহ আমি তাদেরকে সকালবেলায় সেখান থেকে নিয়ে আসব। এরা মূলত অন্য প্লাটুনের সাথে এসেছে। তারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত না। এই অঞ্চলের বাসিন্দাও না। এ জন্যই তারা সেই টিলার ওপর অবস্থান নিয়েছে। এরা জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছিল যে, এটা আমাদের ভূমি। অথচ তারা আমাদের স্বজাতির লোক নয়। তারা বলে আমরা এই টিলাটি দখলে নেবো। যাই হোক, আমি সকালে তাদেরকে নিয়ে আসব। তোমরা ভয় পেয়ো না। চিন্তা করো না।' এই অবস্থা দেখে ভাইয়েরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

রাতের বেলায় তারা পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বালাল। এটি একটি চিন্তার বিষয়ও ছিল। কারণ আমরা ভাবছিলাম, এটা হয়তো তাদের আর আমেরিকানদের মধ্যকার কোন সংকেত হবে। রাতের বেলায় ঠিকই আমেরিকার বিমান আসলো এবং তাদের ওপর এমনভাবে বোমা হামলা শুরু করল যে, ভয়ে তারা পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে আমরা বললাম, ‘আলহামদুলিল্লাহ। যুদ্ধে মুমিনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’

এক সাথী ভাই যখন বলেছিলেন, ‘আমরা অবশ্যই তাদের ওপর হামলা করব’, তখন আরেকজন আনসার ভাই বলেছিলেন, ‘নাহ, ওদেরকে মেরো না। ওরাও তো আমাদের ভাই।’ তাঁর এ কথা শুনে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং হাসতে লাগল। আমি সাথীদের সাথে কৌতুক করতে করতে বললাম, ‘ইনশাআল্লাহ, এ সংকট কেটে গেলে আমি আকিদা বিষয়ে একটি বই লিখব। সেখানে (الرد على من قال: أصحابنا) **‘যে বলবে ‘আমাদের ভাই’ তার জবাব’** নামে একটি পরিচ্ছেদ রাখব।

তোরাবোরায় যারা আমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা বলে যুদ্ধ থেকে সরে পড়েছিল যে, ‘আরবরা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করতে চায় না। আমাদেরকে বোমা মেরে হত্যাও করতে চায় না।’ এমন কথা বলে তাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ এড়িয়ে গেছে। এটা ছিল অবরোধকালে তাদের অবস্থা। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের এই দোদুল্যমান অবস্থা আমাদের উপকারে এসেছে।

আগেও বলেছি যে, শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ’র যুদ্ধবিদ্যার অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করলেই শাইখের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমত, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ যোগাযোগের বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। এ জন্যই আফগানিস্তানে সকল মুজাহিদ ভাইয়ের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বিষয়টিকে তিনি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করতেন। যাতে পুরো ময়দানের সবার খবর তাঁর জানা থাকে।

আমার মনে আছে, একসময় আমরা শাহিকোটের ভাইদের খবরাখবর সংগ্রহ করতাম। যেখানে পরবর্তী সময়ে প্রসিদ্ধ একটি যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা মাজার-ই-

শরীফের ভাইদের খবর নিতাম। পরবর্তী সময়ে যেখানে তাদের সাথে গাঙ্গীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আমরা খোস্তের ভাইদের সংবাদ সংগ্রহ করতাম। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এসব অঞ্চলের সব ধরনের খোঁজখবর রাখতেন। কখনো যদি তাদের সাথে কোনো রূপ যোগাযোগ নাও করতে পারতেন, তবুও আফগানিস্তানের সব ময়দানের খবরাখবর তিনি সংগ্রহ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরও নজরদারি করতেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে শাইখের এই নজরদারি মুজাহিদদের জন্য অনেক উপকারে এসেছে। গ্রুপ-লিডারদের মধ্য হতে এক ভাই আমাদেরকে এই বলে সর্তক করেন যে, আমাদের ওপর পেছন থেকে শত্রুদের হামলা আসতে পারে।

সেখানে রিবয়ি' আল-ইয়ামানি নামক গুরুত্বপূর্ণ এক ভাই ছিলেন। তিনি কাহতান নামক একটি চূড়ার ওপর অবস্থান করছিলেন। ভাইয়েরা তাকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ'র অবস্থানরত পাহাড়ের পেছন দিকটাতে একটু চেক করে দেখেন। কারণ এই পাহাড়টিতেই শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন। ভাই রিবয়ি' আল-ইয়ামানি ছিলেন পাহাড়ের চূড়াতে, আর শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি যখন পাহাড়ের পেছনে গেলেন, তখন সেখানে একদল মুনাফিককে দেখতে পেলেন। তারা ইবনুশ শাইখ আল-লিবি ও তাঁর সাথীদের পেছন থেকে অনুপ্রবেশ করতে চাইছিল। এই অবস্থা দেখে তিনি মুনাফিকদেরকে আক্রমণ করার জন্য সেখানকার কিছু ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। অতঃপর তারা সকলে মিলে মুনাফিকদের ওপর গ্রেনেড ছুড়ে মারেন এবং পেছন থেকে হামলা করেন।

এ আক্রমণটি ছিল সেসব জবাবি হামলার সূচনা, যেসব হামলার কারণে তোরাবোরার অবরোধ থেকে বের হওয়ার পথ খুলে গিয়েছিল। আর এটি ছিল শাইখ রহিমাহুল্লাহ'র বিচক্ষণতার অপর আরেকটি দিক।

আমেরিকানরা আরব মুজাহিদদের ব্যাপারে অপপ্রচার চালিয়ে বলল, 'আরবরা আমাদের সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছে, তারা অবরোধ থেকে বের হতে অনুগ্রহের আবেদন করছে। তাদের এই প্রত্যেকটি কথাই ছিল বানোয়াট এবং ডাহা মিথ্যা। বরং মুনাফিকরা যখন মুজাহিদদের গুপ্ত হামলার শিকার হচ্ছিল, মূলত তারাই আমেরিকানদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে চাচ্ছিল।

১৪২২ হিজরির ২৭ রমাদান মোতাবেক ২০০১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি হলো। এর কারণ ছিল, মুনাফিকদের লাগাতার হামলাগুলো বিফলে যাচ্ছিল। তারা যখনই আমাদের ওপর হামলা করত, আহত আর নিহত হয়ে ফিরে যেত। অপরদিকে মুনাফিকদের বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্দশা দেখে আমেরিকান বাহিনীও তোরাবোরার ওপর থেকে আক্রমণের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় হীনবল হয়ে গিয়েছিল। আর এত পরিমাণে তাদের বিমান হামলাও মুজাহিদদেরকে স্থানচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে তারা তাদের চিরাচরিত কাপুরুষাচিত কৌশল ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিল।

কুন্দুজ, মাজার-ই-শরীফ ও গাঙ্গীর রণক্ষেত্রে তারা ঠিক একই পন্থাই অবলম্বন করেছিল।

প্রায় দুপুর একটার দিকে যুদ্ধবিরতি হলো। কারণ মুনাফিকদের পাহাড়ে ওঠার সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মুজাহিদরা তাদেরকে গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। সেখানে প্রায় ১০০ জন মুনাফিকের আরো একটি দল ছিল। যারা তোরাবোরার উপত্যকায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল। যাতে তারা মুজাহিদদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তারা মুজাহিদদের ফাঁদে পড়ে যায়। তখন নিরুপায় হয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করল এবং কথার ধরন পরিবর্তন করে বলল, 'আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না। তোমরা তো আমাদেরই ভাই। আর কেনই-বা তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে, আমরা কেন এর সমাধান করছি না? আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করে যুদ্ধবিরতি করতে চাই।'

তাদের কথা শেষ হওয়ার পর শাইখ রহিমাহুল্লাহ-ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি কবুল করেন। এই ১০০ জন মুনাফিক মুজাহিদদের বন্দুকের নলায় ছিল। মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের ওপর আক্রমণের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু শাইখ অনুমতি দিলেন না। বরং নিষেধ করে বললেন, 'না, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার ওয়াদা দিয়েছি। নিশ্চয় এটি শাইখের উন্নত চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত।'

মুনাফিকরা তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে সম্মতি জানাল এবং যুদ্ধবিরতি করে আলোচনায় বসতে একমত হলো। মুনাফিকরা সৈন্য প্রত্যাহার করার পর পরই আমাদের সাথে দেখা করতে চাইল। শাইখকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান

করুন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। বরং যোগাযোগ-প্রতিনিধিকে বললেন, ‘তাদেরকে বলে দাও, আমাদের সাথে অনেক আরব মুজাহিদ আছেন এবং অনেক নেতৃবৃন্দও আছেন। সবার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। আমাদেরকে আগে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে হবে। তাই তোমাদের সাথে আগামীকাল সকালের আগে আলোচনায় বসতে পারছি না।’ জবাবে তারা বলল, ‘ঠিক আছে। আমরা আগামীকাল সকালে তোমাদের সাথে অমুক গ্রামের অমুক জায়গায় একত্রিত হবো এবং আমাদের মাঝে চলমান এই যুদ্ধের ইতি টানব।’ স্বভাবতই তারা আমাদের ভাইদের সাথে প্রতারণা করার ছক এঁকে রেখেছিল। আমি সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করব। মুজাহিদরা সেই রাতেই তোরাবোরা থেকে বের হয়ে যায়। আমি এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচনা করব।

আচ্ছা, মুজাহিদগণ কেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিলেন? এর পেছনে অনেক কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো, আমাদের রসদসামগ্রী প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছিল এবং পাহাড় থেকে বরফ গলে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল। হয়তো এক সপ্তাহ বা তার আগেই বরফ গলা শুরু হবে। সর্বদিক থেকে আমরা কঠিন অবরোধের মধ্যে ছিলাম। ঠান্ডায় পানিগুলো পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ছিলাম পাহাড়ের উঁচু টিলার ওপরে আর পানি ছিল আমাদের থেকে প্রায় ৫০০ মিটার নিচে। আমি শাইখের সাথে যেই টিলাতে ছিলাম, সেখানে আমাদের পাশেই একটি পানির ঝর্ণা ছিল। কিন্তু সেই পানির উপরিভাগ জমে গিয়েছিল। পানি আসত ঠিক, কিন্তু উপরিভাগ ছিল জমাটবাঁধা। তার ওপর দিন-রাত অনাবরত বোম্বিং হচ্ছিল ভাইদের ওপর। ওদিকে মুনাফিকরা জালালাবাদ ও কান্দাহারের পূর্ণ নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছে। অবশেষে শাইখ তোরাবোরা খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যাতে আমরা গেরিলা যুদ্ধের এক নতুন স্তর শুরু করতে পারি।

আর এই রাতেই, অর্থাৎ ২৭ রমাদানের রাতেই ভাইয়েরা তোরাবোরা থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকগোষ্ঠী ব্যাপারটি বুঝতে পারে পরের দিন অর্থাৎ ২৮ রমাদান সকালে। তখন তারা অনুভব করল যে, এখানে কেউ নেই। কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। অবশেষে যেসব ভাইয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হতো, তাদের একজন যখন বলল, ‘তোমরা কী চাও?’ তখনই তারা নিশ্চিত হলো যে,

মুজাহিদরা বের হয়ে গেছে অথবা মুজাহিদদের বড় একটি অংশ বের হয়ে গেছে। অথচ আগের দিন তারা বলেছিল, ‘আমরা তোমাদের সাথে সমস্যার সমাধান করতে চাই।’ কিন্তু আজ আবার কথার সুর পরিবর্তন করে বলছে, ‘আমরা তোমাদের হত্যা করব!’ যখন তারা বুঝতে পারল যে, মুজাহিদরা তাদের ষড়যন্ত্রে পা দেয়নি, তখন তারা এভাবেই কথা বলতে থাকল।

এই ঘটনার পর আমেরিকা দাবি করল যে, আমরা তখন তোরাবোরায় ছিলাম। কিন্তু কীভাবে?! তারা তো ভয় আর হীনম্মন্যতার চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করছিল এবং তোরাবোরায় প্রবেশ করতেই ভয় পাচ্ছিল। বরং মুজাহিদরা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথমে মুনাফিকরা প্রবেশ করেছে এবং মুনাফিকদের প্রবেশের দুদিন পর ভীতু আমেরিকা প্রবেশ করেছে।

এমনকি আমরা মুনাফিকদেরকে পরস্পর ওয়ারলেসে বলতে শুনেছি যে, ‘খচ্চরগুলো পাঠাও। মেহমানরা তো ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাদের ওপর ঠান্ডা চেপে বসেছে।’ সে এর দ্বারা আমেরিকানদেরকে উদ্দেশ্য করছিল। এটা হচ্ছে আমেরিকার বিশেষ ফোর্স পাহাড় ও বিমান ডিবিশন ৮২-এর সৈনিকদের ঘটনা।

মুজাহিদরা যখন আল্লাহর পথে অটল থাকে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার সংকল্প করে, তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা যখন তোরাবোরা থেকে বের হয়ে যাই, তখন আমি মুহাম্মাদ যামানকে বিবিসিতে সাক্ষাৎকার দিতে শুনলাম। বিবিসির সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করছিল, ‘হাজি সাহেব! আরবরা কোথায়? আপনারা তো বললেন, এখানে ৫০০ জন আরব ছিল, ১০০০ জন আরব ছিল। কিন্তু কোথায় তারা?’ সে বলল, ‘আরবরা সবাই মারা গেছে।’ সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে মারা গেছে?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ। সেখানে প্রায় ২০০ জনের মরদেহ আছে।’ আমি তো শাইখের আগেই বের হয়ে এসেছিলাম। তার এসব কথা শুনে আমি বললাম, ‘সুবহানাল্লাহ! ২০০ জন! কীভাবে?!’ এ কথা স্পষ্ট যে, তাদের দেয়া এসব তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অপপ্রচার। এসব মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য হলো, আমেরিকার কাছ থেকে যেই পয়সা তারা

নিয়েছিল, তার একটা বৈধতা দাঁড় করানো। আর আমেরিকাও তার জনগনের কাছে প্রমাণ করতে চাইল যে, তারা কিছু একটা করেছে।

এরা শাহিকোটেও এই একই ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বলেছিল, 'শাহিকোটে এত এত আরব রয়েছে। সেখানে ১০০০ আরব রয়েছে, ২০০০ আরব রয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি...। আমরা অচিরেই সেখানে প্রবেশ করব। তাদের ওপর হামলা করব। আমরা এটা করব। ওটা করব।' অবশেষে তারা বলল, 'মার্কিন বাহিনী শাহিকোট থেকে সরে গিয়েছে এবং সেখানে বোম্বিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রিয় উম্মাহ, এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকে জিহাদি মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

ভাইয়েরা আমার, এ যুদ্ধে জিহাদি মিডিয়া আমেরিকার মিথ্যা মুখোশ খুলে দিয়েছে। এবং ক্রুসেড-জোট ন্যাটো ও তাদের সহযোগী মুনাফিকদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছে।

তারা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে ইরাকের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং ৯/১১ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রতিটি ক্রুসেড যুদ্ধকে সিএনএন-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেছে। জিহাদি মিডিয়াগুলো তাদের এই স্বল্প সরঞ্জাম নিয়ে আরব মিডিয়ার মুখোশ খুলে দিয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষে যে চিত্র প্রকাশ করা কখনো সম্ভব হতো না, সে চিত্রকে জিহাদি মিডিয়াই প্রকাশ করে দিয়েছে।

আমি এখানে জিহাদি মিডিয়া নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই,

প্রিয় ভাইয়েরা, হে জিহাদি মিডিয়ার বীর সৈনিকেরা, তোমরাই তো আমেরিকাকে শঙ্কিত করতে, তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করতে, তোমরাই তো তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছ মিডিয়া-যুদ্ধে। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে মুজাহিদ ভাইয়েরা লন্ডন, মাদ্রিদ, বালির হামলা এবং ৯/১১-এর বরকতময় হামলার মাধ্যমে ময়দানের যুদ্ধকে কাফেরদের ভূমিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। এবং আমরাও বিভিন্ন প্রকাশনা, লেকচার, ভিডিও এবং জিহাদি পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের ওপর মিডিয়াতেও জয়ী হয়েছি।

প্রিয় ভাইয়েরা, যে মার্কিন শত্রু এবং মার্কিন মিডিয়াকে আমরা এক সময় দিশেহারা এবং ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম, সেই মার্কিন মিডিয়াই আজ আমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে আমাদের মিডিয়াকে প্রতিহত করেছে। জিহাদি মিডিয়া যেন এখন জিহাদের অবকাঠামো ধ্বংসের একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জিহাদি মিডিয়াগুলো আজ গালি, অপবাদ আর সমালোচনা দ্বারা ভরে গেছে। মুজাহিদদের নেতৃত্ব ও শাইখদের থেকে শুরু করে একজন সর্বনিম্ন স্তরের ভাইয়ের পর্যন্ত সমালোচনা করছে। এটা এখন যে কারো সমালোচনার উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আমি জিহাদি মিডিয়াকর্মী ভাইদের প্রতি সবিনয় নিবেদন করব, আপনারা প্রতিটি কথার গুরুত্ব ও জিম্মাদারি অনুধাবন করুন। প্রতিটি কথাই আমানত। মিডিয়া একটি অনেক বড় আমানত।

অতএব এমন কিছু প্রকাশ করবেন না, যা মুজাহিদদের কাতারগুলোকে বিভক্ত করে দেয়, তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতাকে উসকে দেয়। এমন কিছু পরিবেশন করবেন না, যা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করে এবং মুজাহিদদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়।

আমরা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ও শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র অধীনে একই পতাকাতলে ছিলাম। আমরা কাঁধে কাঁধ রেখে যুদ্ধ করেছি। যার কারণে আমাদের ওপর রব্বুল আলামিনের রহমত নাযিল হতো।

এখন শুরু হলো বিভক্তি আর বিচ্যুতি। একেকজন একেক চিন্তাচেতনা লালন করছে, একেকজন একেকদিকে ছোটাছুটি করছে। আমাদের নিজেদের মাঝেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! এসব কারণেই আমরা বিজয় অর্জন করতে পারছি না। আমাদের থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। আমি আমার মিডিয়া যোদ্ধাদের বলব, আপনারা কথা বলার দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করুন। এক মাজমুআ সম্পর্কে আরেক মাজমুআর সমালোচনাকে কোনোভাবে মেনে নেবেন না। এরা কাফের, ওরা বিশ্বাসঘাতক, এরা মিলিশিয়া, ওরা হত্যাযোগ্য দল—এ ধরনের সব কথা বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের কথায় যে অংশ নেবে, আল্লাহর সামনে সে-ই তার জবাবদিহি করবে।

আমি এবং আমার ভাইয়েরা ব্যক্তিগত যেকোনো বিষয়ে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু মুজাহিদদের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং তাদের মাঝে ফাটল ধরায় এমন কোনো বিষয়কে আমরা ক্ষমা করব না।

আমার এ বার্তা যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়।

আমরা পুনরায় শাইখের যুদ্ধ পরিচালনার অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে যাই। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ ২৭ রমাদানের এই রাতে সকল মুজাহিদ ভাইদেরকে তোরাবোরা থেকে বের করার জন্য বিন্যস্ত করছিলেন। আর শাইখকে তোরাবোরা থেকে যিনি বের করেছিলেন, তিনি হলেন মৌলভি নূর মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীগণ। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সেই রাতে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ শাইখ ইবনুশ শাইখ আল-লিবির কাছে গিয়েছিলেন। উভয়ে মুজাহিদদেরকে নিরাপত্তার সাথে বের করার জন্য পরিকল্পনা করছিলেন। মৌলভি নূর মুহাম্মাদ তাঁকে তাড়া দিয়ে বলছিলেন, ‘সামনে আমাদের দীর্ঘ সফর। এখনই আমাদেরকে বের হতে হবে।’ কিন্তু শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ নিজে বের হলেন রাত ১১টার দিকে। আর এটা তাঁর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। শাইখের এটাই চাওয়া ছিল যে, সকল সাথী নিরাপদে বের হয়ে যাক। তারপর আমি বের হবো। তিনি তা-ই করেছেন।

আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই সমাপ্ত করলাম। ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বে আরো আলোচনা হবে।

و الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله

***